আদর্শ বিবাহ পদ্ধতি

(কুরআন-সুন্নার আলোকে)

মোঃ তাহেরুল হক

আদর্শ বিবাহ পদ্ধতি

(কুরআন-সুন্নাহর আলোকে)

মো: তাহেরুল হক

বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট

প্রকাশক:
বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাষ্ট
২৭ বি লেনিন সরণী
কোলকাতা-৭০০ ০১৩

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী, ২০২১

বিনিময়: ১৫ টাকা

মুদ্রণে: **মিমঝিম বুক বাইন্ডিং**
কলকাতা-৭০০০০৯

ADARSHA BIBAHO PODDHOTI
By Md. Taherul Haque

Published by: Bangla Islami Prakasani Trust
27B, Lenin Sarani, Kolkata-13

Printed by: Mimjhim Book Binding
Kolkata-700 009

Price RS. 15/- only

হার্দিক আবেদন

সমকালের অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলাম নিছক ধর্ম নয় বরং জীবন যাপনের সকল বিষয়ে এবং সকল বিভাগের জন্যও পরিপূর্ণ এক জীবন বিধান (A Complete Cade of Life)। মানুষ নিছক ব্যক্তি নয়, বরং বৃহত্তর সমাজের অংশ। সমাজের ভিত্তি পরিবার, আর পরিবার গড়ে ওঠে এক জোড়া যুবক যুবতীর বৈবাহিক সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে। যে কোন জীবের ন্যায় মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য পরস্পরের বিপরীত লিঙ্গ বা নর-নারীর দরকার। পরস্পরের পরিপূরণে উভয়ের জীবন হয়ে ওঠে শান্তি ও সুখময়। শান্তিময় জীবনের জন্য বিবাহ একটি সামাজিক এবং ধর্মীয় বিধান। আমরা অনেকেই স্বচোখে ভালো সমাজ দেখতে চাই। ভাল সমাজ আকাশ থেকে নামে না, তার জন্য সমাজ জীবনের কতক নীতিমালা সামনে রেখে নর-নারীর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে সমাজ গড়ার কাজ করতে হয়। কিছু গড়তে গেলে কিছু ভাঙতে হয়। ভাঙা গড়া জীবন নদীর বাঁক-এবং চিরন্তন নিয়মও। গড়তে হলে কিছু সাফ করতে হয়। আজকের সমাজ জীবনে আছে কতক অনাচার, কুসংস্কার, আবর্জনা ও নীতিহীন রসম-রেওয়ায। শান্তির লক্ষ্যে তা নিয়ে ভাবতে হবে।

প্রতিটি মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং অনুগ্রহ কামনা করে সুখ শান্তির আধার হল আল্লাহ। মানুষ আল্লাহর কাছে সুখ শান্তি চায় অথচ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আল্লাহর দেওয়া পারিবারিক নীতিমালা এবং সামাজিক পদ্ধতি ও নিয়মশৃঙ্খলা মানতে আগ্রহী নয়। সুখী জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে দাম্পত্য জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য—যাতে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনকে সুখী সুন্দর ও শান্তিময় করা যায়। দাম্পত্য জীবনে শান্তির পরিবেশ বজায় না থাকলে যে কোন মানুষের কর্মজীবনে তার প্রভাব পড়ে। নিত্যদিনের স্বাভাবিক কাজকর্ম সুস্থভাবে করার ক্ষেত্রে হোঁচট খেতে হয়। প্রাত্যাহিক জীবনের ব্যস্ততায় মানসিক সমস্যা নিয়ে দায়-দায়িত্ব পালনে কষ্ট হয়। মূল সমস্যা হল দাম্পত্য জীবনের সমস্যা, যা হৃদয়ের মর্মস্থলে কষাঘাত হানে। মনকে অস্থির ক'রে রাখে। 'বিবাহ —মনকে প্রশান্তি দেয়' (সূরা রূম, আয়াত:২১)[১]। তাই পরস্পরের জীবনকে শান্তি ও সুখের সহায়ক করার রসদ হিসাবে এই পুস্তিকাটি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সাফল্য—তা আল্লাহর দান, ত্রুটি থাকলে তা আমার।

বিনীত

মো: তাহেরুল হক

সেক্রেটারী, ইসলামী সমাজ বিভাগ

(জামাআতে ইসলামী হিন্দ, পশ্চিমবঙ্গ)

সূচীপত্র

বিষয়	*পৃষ্ঠা*
হার্দিক আবেদন	৩
বিবাহের আগে শরীয়তের বিধান	৫
বিবাহ কি?	৫
বিবাহের উদ্দেশ্য	৬
বিবাহের বয়স	৭
বিবাহের পূর্বে প্রেম নিষেধ	৮
আর্থিক সচ্ছলতা?	১০
পাত্র-পাত্রী নির্বাচন	১১
নিষিদ্ধ পাত্র-পাত্রী	১৩
কফু বা সমতা কি আবশ্যিক?	১৪
অভিভাবক আবশ্যক	১৫
বিবাহ হবে প্রকাশ্যে	১৭
দৃষ্টান্তমূলক বিবাহ	১৭
সহজ বিবাহ	১৮
বিবাহের প্রীতি উপহার-মোহর আবশ্যক	১৮
মোহরের পরিমাণ কি হবে, কতটা হবে?	২০

বিবাহের আগে শরীয়তের বিধান

বিবাহ কি?

প্রত্যেক মানুষ—নর হোক কিংবা নারী—মানসিক শান্তি সুখের জন্যে বিবাহ প্রয়োজন। বিবাহ একটা সামাজিক চুক্তি বা বন্ধন। পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য মনের শান্তিকে স্থির করা। এটা তখনই সম্ভব যখন উভয়ে একে অপরকে ভালভাবে জানবে। তাই বিবাহ চটজলদি বা আবেগের বশে নয়। বরং আনুসঙ্গিক বিষয়গুলো ভালোভাবে না জানলে পরবর্তী সময়ে অনুশোচনা আসে, উভয়ের জীবনে ক্ষতিও হয়। বিবাহ সামাজিক কর্তব্য। এর সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনগত দিকও আছে।

সমাজের ভিত্তি পরিবার। পরিবারের ভিত্তি নারী পুরুষের বিবাহের মাধ্যমে সুখ শান্তির দাম্পত্য জীবন। কেউ বলেন, 'সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে'—এর মধ্যে আংশিক বা আপেক্ষিক সত্যতা ও বাস্তবতা থাকলেও সর্বাংশে সত্য নয়। 'দাম্পত্য জীবনে পুরুষই নারীর অভিভাবক'। (সূরা নিসা, আয়াত-৩৪)[২] তাই পুরুষকেও হতে হবে সৎ নিষ্ঠাবান, আল্লাহভীতি সম্পন্ন। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তব্য অধিকার সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় কতক সংসার নষ্ট হয়। একটা দাম্পত্য জীবনের সংসারকে সব দিক দিয়ে সুখের করতে হলে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ নীতিমালা বুঝতে হবে। বিবাহের ধর্মীয় দিক হল, এটা একটা এবাদত। রাসূল (সা.) বলেছেন—'একজন ব্যক্তি যখন বিবাহ করে, তখন তার দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ হয়। বাকী অর্ধেক পুরণ করার জন্যে সে আল্লাহকে ভয় করে চলবে।' (মেশকাত-৩০৯৬)[৩] আরো বলেছেন: 'হে যুবক বৃন্দ বিবাহে সক্ষম প্রত্যেকেই বিবাহ কর। কেননা তা কুদৃষ্টিকে রোধ করে এবং লজ্জাস্থানকে করে সুরক্ষিত।' (বুখারী-৫০৬৫/মুসলিম)[৪] 'যে বিবাহ করে

না, সে নবীর উম্মাত নয়।' (বুখারী-৫০৬৩)[৫] এই কারণে 'সকল যুগে নবী-রাসূলগণকে স্ত্রী ও সন্তানসহ জীবন যাপন করতে হয়েছে।' (সূরা রা'দ, আয়াত-৩৮)[৬] আল্লাহর সৃষ্টির মহিমা হল—'তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন।' (সূরা ফুরকান, আয়াত-৫৪)[৭] কোনও মুসলমান সঙ্গত কারণ ছাড়া বিবাহহীন থাকতে পারে না। 'তোমাদের যারা জুড়িহীন, সৎকর্মশীল-স্বাধীন মানুষ হোক বা দাস—তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও।' (সূরা নূর, আয়াত-৩২)[৮] তাই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহ ও সংসার জীবনের মাধ্যমে প্রকৃত মুসলিম থাকা যায়। বৈরাগ্য বা সংসার জীবন ত্যাগ করাকে ইসলাম অনুমোদন করে না।

বিবাহের আইনগত দিক হল—পুরুষ ও নারীর সম্মতিতে এবং কমপক্ষে দু'জনের সাক্ষীতে বিবাহের সুদৃঢ় বন্ধনে উভয়ে সারা জীবনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তির লক্ষ্য হল, সমাজের অন্যান্য মানুষ যেভাবে সংসার জীবন-যাপন করে, এখানে তারাও তা করবে। নিয়মনীতির ব্যতিক্রম হলে বিবাহ সংক্রান্ত নীতিমালার সম্মুখীন হতে হবে। বিচার, সালিসী, অপরাধের শাস্তির সবই প্রাপ্য হবে। সুখের জীবন বরবাদ হতে পারে।

বিবাহের উদ্দেশ্য

কুরআন বিবাহের দুটি বিধান স্পষ্ট করে যে, 'আল্লাহর নিদর্শন এই যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের মাধ্যমে শান্তিলাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করেছেন।' (সূরা রূম, আয়াত: ২১)[৯]

সুতরাং মনীষীগণের সিদ্ধান্তে বিবাহের পাঁচটি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়। (ক) জৈবিক-যৌন চাহিদার দমন হবে। (খ) পারিবারিক জীবনে মানুষ শৃংখলা মেনে চলবে। (গ) মানুষের বংশধারা বজায় রাখবে (৪) সংসার ও সন্তান পালনে মনোযোগ দেবে। (৫) ভাবী প্রজন্মকে সৎ সুন্দরভাবে গড়ে তুলবে। জীবনের বহু ব্যস্ততা ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে মানুষ সংসারের সুখ চায়। 'পুরুষ ও নারী পরস্পরের পরিপূরক, পরস্পরের জন্য

পোশাক তুল্য।' (সূরা বাকারা, আয়াত:১৮৭)[১০] তাই বিবাহ সংক্রান্ত কতক নীতিমালা বিবাহের আগে মানতে হয় এবং বিবাহের পরেও কতক নীতিমালা মানতে হয়। বিবাহের-পূর্বের কতক আদর্শ বিধান মানলে সমাজ জীবনে মানুষ সুখী হতে পারে। শান্তি-শৃঙ্খলাও বজায় থাকে।

বিবাহের বয়স

ভারতবর্ষে ছেলের জন্য ২১ বছর এবং মেয়ের জন্য ১৮ বছর পূর্ণ না হলে বিবাহ আইন সিদ্ধ হয় না। ১৫ থেকে ১৮ বছর না হলে বিয়ে দেওয়া যাবে না, এমন আইন আছে বাংলাদেশ, আলজেরিয়া, মিসর, ইরাক, জর্ডন, লিবিয়া, মরক্কো, পাকিস্তানসহ অনেক দেশে।

ইংরেজ যুগের সারদা আইন-১৯২৯ সংশোধন করে মেয়ের বিয়ের বয়স ১৫ থেকে ১৮ বছর এবং ছেলের ১৮ থেকে ২১ বছর করা হয়। আবার বর্তমানে (২০২১) ভারত সরকার যা জয়া জেটলি নামক এক রাজনৈতিক ও সমাজকর্মীর নেতৃত্বে ১০ সদস্যের টাস্কফোর্স গঠন করেছে। মেয়েদের এবং ছেলেদের বিয়ের বয়স ২১ এবং ২৫ করা যায় কিনা তা নিয়ে ভাবা হচ্ছে।

ইসলাম উভয়ের সাবালকত্ব বা বালেগ হওয়াকে বিয়ের বয়স নির্ধারণ করে। বিবাহের বয়স সংক্রান্ত তিনটি আয়াত থেকে এক নীতিমালা পাওয়া যায়। যেমন (১) 'আর ইয়াতীমদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে (সাবালকত্বে) পৌঁছায়।' (সূরা নিসা, আয়াত: ৬)[১১] (২) 'তোমাদের সন্তান সন্ততি যখন বয়স প্রাপ্ত হয়, তারা যেন তাদের পূর্ববর্তীর ন্যায় অনুমতি নেয়।' (সূরা নূর, আয়াত: ৫৯)[১২], (৩) 'আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছায়নি তাদেরও ইদ্দতকাল (হবে তিন মাস)।' (সূরা তালাক, আয়াত: ৪)[১৩]

বিবাহ হলে তবে তালাকের প্রশ্ন আসে। 'তালাকপ্রাপ্তা কন্যার বয়স যদি ঋতু হওয়ার বয়স না হওয়া পর্যন্ত'— এই বোঝায় তাহলে তার বিবাহ হতেও পারে। কাজেই সাবালকত্ব হওয়ায় বিয়ের বয়সের সূচনা হয়।

সাবালকত্বের বয়সে না পৌঁছলেও একান্ত প্রয়োজনে বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে। হযরত আয়েশা (রা.)-এর ৬ বছর বয়সে বিবাহ হয় এবং ৯ বছর বয়সে (সাবালকত্বের পৌঁছানোর পর) স্বামীর ঘরে গিয়েছেন। কুরআনের আয়াতের বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিয়ের জন্য সাবালকত্ব সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসুলের যুগে আর বাল্যবিবাহ হয়নি। তাই বিবাহের জন্য সাবালকত্ব একটা মৌলিক নীতিমালা। কিন্তু বাল্যবিবাহকে ইসলাম উৎসাহিত করে না। করলে এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর বাল্যবিবাহের কিছু ঘটনা ঘটতো। বাল্যবিবাহে উৎসাহ না থাকলেও পারিবারিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এমন থাকে, যা উপেক্ষা করলে ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই ব্যতিক্রম হিসেবে এটারই বৈধতা স্বীকার করা ভালো। বিবাহ মানে সংসার জীবনের দায়বদ্ধতার সূত্রপাত। তার জন্য জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির স্বচ্ছতা ও পরিপক্কতা দরকার। কৈশরে তারুণ্যে বয়সের উদ্যামতা ও চাঞ্চল্য থাকে। তাই সামাজিকতা ও সংসার জীবনে দায়বদ্ধতার চেতনা আসলেই বৈবাহিক জীবনে সুখী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং বয়সের সাথে দায়বদ্ধতার চেতনার সামঞ্জস্য হলে দাম্পত্য জীবনে সমস্যা কম হয়।

বিবাহের পূর্বে প্রেম নিষেধ

অনেকেই বলেন— 'প্রেম পবিত্র জিনিস', কিন্তু তা কখন? বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর একে অপরের সাথে অন্তরের গভীর প্রীতি ভালোবাসা উজাড় করার নাম প্রেম। বিবাহের পূর্বে তা করা হলে সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। পারিবারিক শৃঙ্খলার নীতিমালা বিনষ্ট হয়। যেনা-ব্যভিচারের পথ সুগম হয়। দৈহিক মিলনে কেবল যেনা হয়, তা নয় বরং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও যেনা হয়। হাতের, পায়ের, চোখের, কানেরও যেনা হয়। নিজের স্ত্রী নয় এমন যে কোন নারীর সাথে একাত্মতা গড়ে আলাপচারিতায় যেনা হয়। যেনা বা ব্যভিচার মহাপাপ-কবিরা গুনাহ। এই কারণে সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য কুরআন স্পষ্ট করেছে যে, 'মুমিনদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌন

চাহিদাকে হেফাযত করে— এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে।' (সূরা আন নূর, আয়াত: ৩০- ৩১)[১৪] এ নির্দেশ ছেলে মেয়ে, নর-নারী সবার জন্যই বলা হয়েছে। 'মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-হাত, পা, চোখ, কান, চামড়া, তার জন্য টেপ রেকর্ডার, সিসি ক্যামেরাও। পরকাল বিশ্বাসী প্রত্যেক ব্যক্তির কৃতকর্ম এক সময় তার অঙ্গগুলিও তার অপরাধ ধরিয়ে দেবে।' (সূরা হা-মীম সাজদা, আয়াত:২০-২২)[১৫] 'মানুষ তার শরীরকে কিভাবে ব্যবহার করে সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে।' (সূরা ইসরা, আয়াত: ৩৬)[১৬]

এছাড়া ব্যভিচার বলে যে ধারণা পাওয়া যায়, তা নিছক দৈহিক মিলন নয় বরং ব্যভিচারের সম্ভাবনা থাকে এমন আচরণ, ব্যবহার, মেলামেশা করা যাবে না। শরীরের শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহিত হওয়ার ন্যায় ব্যভিচারের পরিবেশ তৈরী ক'রে শয়তান মানুষকে প্রলুব্ধ করবেই। এই মনস্তত্ত্বের পর্যবেক্ষণ আছে কুরআনে যে: 'তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না, নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ।' (বণী-ইসরাঈল, আয়াত:৩২)[১৭]

আজকের ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায়—'লা তাকরাবুয যেনা'-এর মর্মকথা প্রায়ই মরীচিকার ন্যায় ডুকরে কাঁদছে। যারা বলে ঈমানদার? তাদের অনেকেরই পরিবার পরিবেশের উপর আমল নেই। এবাদতে হিরো, মুতামেলাতে জিরো। কুরআনের আরও স্পষ্ট ঘোষণা যে, 'কোন ভাবেই গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হয় না।' (৫:৫, ৪:২৫)[১৮] নেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে অনেকেরই প্রেমের বন্যা বইছে। সমাজের কৈশর তারুণ্য প্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা এর মাধ্যমে যেভাবে পাপে লিপ্ত হচ্ছে তা অকল্পনীয় বাস্তব। সমাজ জীবনকে রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব। ভারতের অসংখ্য দর্শনীয় স্থানে এর জন্য উত্তেজনাকর উস্কানি আছে। প্রতিটি শহরের পার্কে, নদী ও সমুদ্র কেন্দ্রিক কিনারায় এ রকম পাপের পাওয়ার হাউজ বসে। এ সব কি অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা নয়? ইসলামের ভগ্নাংশ নিয়ে মুসলমান আছে, পূর্ণ দ্বীনের চেতনা ও আমল নেই। শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনে কি কৈফিয়ত দেবে, তার জন্য মাকড়সার জাল তুল্য বাহানা খুঁজছে। আল্লাহ কি ছাড়বেন

বলে মনে হয়? ইসলাম কি 'নাহ্‌য়ী আনিল মুনকার'—এর তালীম দেয় না? (সূরা আনআম, আয়াত: ১৫১, সূরা আরাফ, আয়াত: ৩৩)[১৯] ফাহেশা বা অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতাকে হারাম করেছে, তা থেকে দূরত্বে অবস্থান করতে বলেছে, তা কাদের জন্য? আমাদের রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যারা দুটি জিনিসের দায়িত্ব নেবে, তিনি তাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নেবেন- (১) দুই ঠোঁটের মাঝে যা (জিহ্বা) তার এবং দুই পায়ের মাঝে যা (যৌনাঙ্গ) তার ব্যবহারের দায়িত্ব।'[২০]

সুতরাং বিবাহপূর্ব জীবনে প্রেমের সামান্যতম অবকাশ না থাকারই কথা। অল্প বয়সে প্রেমজনিত বিবাহ ও সাংসারিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিবেশে অনেক সময় কঠিন বিচ্ছিন্নতা এবং কলঙ্ক বয়ে আনে। এমন অসংখ্য কারণে ইসলাম বিবাহপূর্ব জীবনের জন্য কতক নির্দেশ ও নীতিমালা পেশ করেছে। আদর্শ মুসলিম সমাজ গড়ে তোলার জন্য নিছক আনুষ্ঠানিক এবাদতে মশগুল থাকলে চলবে না, বরং মোয়ামেলাত বা ব্যবহারিক জীবনেও ইসলামের নীতিমালা মেনে চলার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে চলতে হবে।

আর্থিক সচ্ছলতা?

কুরআন বলে, 'যারা অর্থ সম্পদের দিক দিয়ে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না এবং বিবাহ করলে আশঙ্কা আছে যে, স্ত্রীর অধিকার আদায় না করার কারণে গুনাহগার হয়ে যাবে, তারা যেন পবিত্রতা ও ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে। যে পর্যন্ত না আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মালদার করে দেন।' (সূরা নূর, আয়াত: ৩৩)[২১]

এই ধৈর্যের জন্য হাদীসে একটা পন্থা বলা হয়েছে যে, 'তারা বেশি পরিমাণে রোযা রাখবে। তারা এমন করলে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে বিবাহের সামর্থ্য পরিমাণ অর্থ সম্পদ দান করবেন।' (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, পৃষ্ঠা /৪৩) আর্থিক সচ্ছলতা বিবাহে বাধা নয়। কুরআন বলে, 'তারা যদি নিঃস্ব গরীব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল

করে দেবেন।' (সূরা নূর, আয়াত:৩২)[২২] এর ব্যাখ্যায় তাফহীমুল কুরআনে আছে- 'এ ব্যাপারে লোকেরা যেন খুব বড় হিসাবী হয়ে না দাঁড়ায়। এতে কন্যা পক্ষের জন্য হেদায়েত আছে যে, কোন ভালো স্বভাব চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তি তার ঘরে বিবাহের পয়গাম পাঠায়, তবে কেবল তার দরিদ্র অবস্থা দেখেই যেন তা প্রত্যাখ্যান না করে। আর ছেলে পক্ষকে হেদায়েত করে যে, ছেলে এখনো খুব বেশি কামাই রোজগার করছে না বলে তাকে যেন অবিবাহিত রাখা না হয়। আর সাধারণভাবেই সমস্ত যুবকের প্রতি হেদায়েত ও শিক্ষা এই যে, অধিক আর্থিক স্বাচ্ছন্দ প্রাচুর্যের আশায় বিবাহের ব্যাপারটিকে মুলতবি করে রাখা তাদের উচিত হবে না। অল্প আয় হলেও আল্লাহর উপর ভরসা করে বিবাহ করা উচিত। অনেক সময় শুধু বিবাহ মানুষের আর্থিক অবস্থা ভাল হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। ব্যয় কাজটা স্ত্রীর সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। দায়িত্ব মাথার উপর এসে গেলে মানুষ আপনা হতেই অধিক পরিশ্রম করতে এবং আয় বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতে উদ্যোগী হয়।' (তাফহীমুল কুরআন সংশ্লিষ্ট আয়াত দ্রষ্টব্য)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, 'তোমরা যদি ধনী হতে চাও, তবে বিবাহ করো। কেননা আল্লাহ বলেছেন তারা গরীব হলেও আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন।' (ইবনে কাসির ১৫/১৫২)[২৩]

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, 'ব্যভিচার থেকে বাঁচার জন্য যে বিবাহ করে তাকে সাহায্য করার দায়িত্ব আল্লাহর।' (নাসাঈ, তিরমিযী, আহমদ)[২৪]

পাত্র পাত্রী নির্বাচন

বিবাহের আগে পাত্র কিংবা পাত্রী নির্বাচন কোনো রকম হালকা কথা নয়। বংশ, পরিবেশ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও যখন নারী-পুরুষকে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে জীবন যাপন করতে হবে তখন পরস্পরকে নির্বাচন করার জন্য নির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা একান্ত প্রয়োজন। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'সমগ্র দুনিয়া তোমাদের জন্য আসবাব সামগ্রী। সর্বোত্তম সামগ্রী হলো সৎ স্ত্রী।' (মুসলিম)[২৫]

নবী (সা.) বলেছেন, 'নারীকে স্ত্রী হিসেবে বিবাহ করার জন্য চারটি জিনিস দেখবে, ১) আর্থিক অবস্থা, ২) বংশ পরিচয়, ৩) দেখতে সুন্দর কিনা এবং, ৪) দ্বীনদারী বা সৎ চরিত্র। প্রথম তিনটির তুলনায় দ্বীনদারীকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিবাহ স্থির করবে।' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত-২৯৪৮)[২৬]

'দ্বীনদারী উপেক্ষা করে অন্যগুলো প্রাধান্য দিলে অসংখ্য রকম বিপর্যয় দেখা দেবে।'[২৭]

এর সঙ্গে বিপরীতমুখী দুটি আয়াতকে সামনে রেখে বৈবাহিক জীবনের নকশা আঁকতে হবে। ক) 'তোমাদের কোন কোন স্ত্রী এবং সন্তান তোমাদের দুশমন।' (সূরা তাগাবুন, আয়াত-১৪)[২৮] খ) 'যারা বলে, হে আমাদের প্রভু, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করো।' (সূরা ফুরকান, আয়াত-৭৪)[২৯] উপরোক্ত হাদীস ও কোরআনের ভাবনা সামনে রেখে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের জন্য বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়ার দরকার আছে। কুরআন বলছে, 'সেই স্ত্রীলোক যাকে তোমার ভালো লাগে তাকে বিবাহ করো।'(সূরা নিসা, আয়াত: ৩)[৩০]

রাসূল (সা.) বলেন, 'বিবাহ করার জন্য যখন তোমরা কোন মেয়েকে প্রস্তাব দেবে, সম্ভব হলে তাকে দেখে নেবে।' (আবু দাউদ, মিশকাত-২৯৭২)[৩১]

ইসলামী আইন ব্যবস্থায় বিয়ের আগে পাত্র তার সম্ভাব্য পাত্রীকে এবং পাত্রী তার সম্ভাব্য পাত্রকেও দেখার অধিকার রাখে। কিন্তু নারীর অধিকার থাকলেও তা নিরঙ্কুশ নয়। সকল স্বাধীনতাকে সংযমের মধ্যে রাখাই মানব জীবনকে সুন্দর করার মূল বৈশিষ্ট্য আছে। নদীর প্রবাহ তখন উপকারী হয়, যখন তা বাঁধন মানে। ইসলাম সব স্বাধীনতাকে তীরের সংযমে বাঁধতে চায়। নদীর স্রোত কূলপ্লাবী হলে তা হয় বন্যা, স্বাধীনতা অসংযত হলে তা হয় বিশৃংখলা। ইসলাম নারীর পাত্র নির্বাচনের অধিকারকে কতক নির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেছে। ঈমানদার হওয়ার দাবি করে জাহান্নামের পথে চলতে নিষেধ করে।

আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম। যদিও তাদেরকে তোমাদের ভাল লাগে। এবং তোমরা (নারীরা) কোন মুশরিকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরিকের তুলনায় ভালো। যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। তারা জাহান্নামের দিকে ডাকে আর আল্লাহ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহ্বান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে।' (সূরা বাকারা, আয়াত: ২২১)[৩২]

ইসলাম মিশ্র বিবাহের কোনো অবকাশ দেয় না। ঈমান ব্যতীত ভিন্ন পাত্র কিংবা ভিন্ন পাত্রী গ্রহণ করার অর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে তারা জাহান্নাম মুখী হয়। একটা নিষ্কলুষ আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার জন্য নির্মল পরিবার ও দাম্পত্য জীবন হতে হবে নিষ্কলুষ ও পবিত্র।

নিষিদ্ধ পাত্র-পাত্রী

কুরআন যে সকল নারী ও পুরুষের মাঝে বিবাহ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করেছে তার ভিত্তি তিনটি— বংশ সম্পর্ক, দুগ্ধপানের সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক।

বংশ সম্পর্কে সাত প্রকার নারীকে বিবাহ করা হারাম। সূরা নিসার ২৩ নম্বর আয়াতের বিশদ বর্ণনায় আছে। এই সাত প্রকার হলো- মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের কন্যা, বোনের কন্যা। মা এবং কন্যা বলতে তাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক আছে তারাও। যেমন নানি, দাদি, বা কন্যার মেয়ে (নাতী) সকল।

দুগ্ধপানের দিক দিয়ে দুধমাতা ও দুধ বোন। দুই বছর বা তার নিম্ন বয়সের শিশুকে যে নারী নিজের স্তনের দুধ খাইয়েছেন তিনি তার দুধ মা। তার কন্যাগণ হবে দুধ বোন। রক্ত সম্পর্কের ন্যায় দুধ খাওয়ার সম্পর্ক বিবাহ সম্বন্ধ করার ক্ষেত্রে হারাম। রাসূল (সা.) বলেছেন—'রক্ত সম্পর্কের কারণে যে যে সম্পর্ক হারাম হয়, দুধ পানের কারণে সেই সেই সম্পর্ক হারাম হবে।' (মুসলিম)[৩৩]

বৈবাহিক কারণে এই চারটি সম্পর্ক হারাম। তা হল- স্ত্রীর মা অর্থাৎ শাশুড়ি, স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যা, নিজ ঔরসজাত সন্তানের স্ত্রী বা বৌমা (নিজ কন্যার ন্যায় বৌমাও হারাম) এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। আজকাল অবাধ মেলামেশার কারণে স্ত্রীর বোনদের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। এটাও প্রেম। এজন্য ইসলাম অবাধ মেলামেশাকে নিষিদ্ধ করেছে। স্ত্রী মারা গেলে অবশ্যই স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করতে পারে। কোন কারনে একত্রে দুই বোনকে বিয়ে করলে একটাকে (পরেরটাকে) তালাক দিতেই হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম হলেও ভিন্ন সমাজে এ অবস্থা বিদ্যমান আছে। অসৎ স্বভাব-চরিত্র দোষে এমন ঘটনা মুসলিম সমাজেও বিরল নয়। এছাড়া কোন নারী অন্যের বৈধ স্ত্রী থাকা অবস্থায় তাকে বিয়ে করা যাবে না। কোরআনের সূরা নিসা (২৩ ও ২৪ নং আয়াত) এ সকল সম্পর্কে বলা হয়েছে 'হুররিমাত আলাইকুম'—'তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে।'[৩৪]

আরেকটি সম্বন্ধকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তা হল—'যে সকল নারীকে তোমাদের পিতা সমূহ বিবাহ করেছে, তোমরা তাদের বিবাহ করো না।' (সূরা নিসা, আয়াত: ২২)[৩৫] তাই বৈবাহিক সম্বন্ধ তৈরী করার আগে এই নীতিমালা উপেক্ষা করলে ঈমান থাকবে না।

কফু বা সমতা কি আবশ্যিক?

বিয়েতে কফু বা সমান সাদৃশ্য হওয়ার গুরুত্ব কতটা? পাত্র-পাত্রীর কোন কোন বিষয়ে সমান বা একের সাথে অপরের সামঞ্জস্য হওয়ার আবশ্যকতা আছে—তা কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে বিবেচনা করতে হবে। চলমান সমাজে আর্থিক ও বংশীয় বিষয়টা সামঞ্জস্য করার জন্য কফুর ধারণা দেওয়া হয়—এটা কিন্তু ইসলাম সম্মত নয়। কফুর হিসাব হবে দ্বীনদারীর দৃষ্টিতে। বংশ, গোত্র, সমাজ বা ভাষার জন্য সম্মত নয়, বরং চরিত্র হবে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের মানদন্ড। সততা, স্বচ্ছতা, সচ্চরিত্রের বিপরীত হবে মিথ্যা, পাপ প্রবণতা, অশ্লীলতা পূর্ণ পাত্র-পাত্রী। সমতার

ক্ষেত্রে ঈমানের সাথে শির্ক ও নাস্তিকতার মিলন নয়। রাসুল সাঃ বলেন, 'তোমরা যখন বিবাহের জন্য এমন ছেলে ও মেয়ে পেয়ে যাবে যার দ্বীনদারী চরিত্র ও জ্ঞানবুদ্ধিকে তোমরা পছন্দ করবে, তো তখনই তার সাথে বিয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করবে।' (তিরমিযী)[৩৬]

আল্লামা খাত্তাবী সুনানে আবু দাউদ এর ব্যাখ্যায় ইমাম মালিকের নিম্নোক্ত কথা পেশ করেছেন যে, 'কফু কেবলমাত্র দ্বীনদারীর দিক দিয়েই লক্ষণীয় ও বিবেচ্য। আর ইসলামী সমাজের সকলেই সকলের জন্য কফু।' (মাআলিমুস সুন্নাহ— ৩/১৮০)

অভিভাবক আবশ্যক

মেয়ে ও ছেলের শরীর, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য যেমন পিতা মাতার দায়িত্ব বর্তায়, তেমনি তারা বড় বা সাবালক হলে তাদের যৌন জীবনের সুরক্ষার জন্য তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করাও পিতা মাতার কর্তব্য। বায়হাকী 'শোআবুল ঈমান'— এ বলা হয়েছে, 'যার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তার উত্তম নাম রাখা ভালো, তাকে আদব-কায়দা বা সামাজিক নিয়ম শৃংখলার শিক্ষা দেওয়া উচিত। আর যখন বালেগ বা পূর্ণবয়স্ক ও বিয়ের যোগ্য হবে তখন তাকে বিবাহ দেওয়া কর্তব্য। কেননা বালেগ হওয়ার পরও যদি তার বিয়ের ব্যবস্থা করা না হয়, আর এ কারণে সে গুনাহ-র সাথে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে তার গুনাহর অংশও তার পিতার উপর বর্তাবে। কেননা পিতা-মাতার অবহেলার জন্য পাপের পথ খুলে যাচ্ছে।' এ কারণে ধমক ও কঠোর বার্তা উল্লেখ করা হয়েছে।

বিয়ের জন্য যোগ্য ছেলে মেয়ের মানসিকতা তৈরী করা কিংবা তাদের ভবিষ্যৎ ভাবনায় বাড়ির পরিবেশ পরিকাঠামো প্রস্তুত করাও সচেতন অভিভাবকে পারিবারিক ভাবনা পরিকল্পনায় থাকতে হবে। কতক সময় ছেলে মেয়েরা অভিভাবককে উপেক্ষা করে নিজেরা বিবাহের কাজ সম্পন্ন করে থাকে। সামাজিক ও ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর উপকারের চেয়ে অপকারের মাত্রা বেশি থাকে। বিশেষত মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে এমন

ইচ্ছার বাস্তবায়নে বিশৃংখলার বড় কারণ হয়। কুরআন স্পষ্ট হুকুম দেয়, 'মেয়েদের বিবাহ দাও তাদের মালিক বা অভিভাবকের অনুমতি নিয়েই।' (সূরা নিসা, আয়াত: ২৫)[৩৭]

কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট বিধান হল, তোমরা তাদের মূল অভিভাবক পিতা, তার অবর্তমানে পরিবারের দায়-দায়িত্ব যার হাতে ন্যস্ত তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলে গুনাহ হবে। সমাজে বিশৃংখলার পরিবেশ তৈরী হবে। এই কারনে চারটি হাদীস গ্রন্থের এমন একটি হাদীসের প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার। তা হল, 'যে মহিলা তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল।' (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত-২৯৯৭)[৩৮] এমন সাবধান বাণী থাকা সত্বেও কতক মুসলিম মেয়ে স্বেচ্ছায় বিবাহ করে, এটা তার জীবনব্যাপী পাপের সূত্রপাত। অপরদিকে যারা তাদের বিবাহ সম্পন্ন করায় তারাও হারাম কাজে সহযোগিতা করে।

(কুরআনের সূরা আল বাকারা ২২১, ২২৩ এবং আন নূর ৩২) আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, অভিভাবকগণই মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা করবে। আবু দাউদ (পৃষ্ঠা ২৮৫) এ নবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মহিলার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে, সে যেনা-ব্যভিচার করে।' ইমাম বুখারী 'ওলী বা অভিভাবক ভিন্ন বিবাহ নয়।'—অধ্যায়ে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

'কোন মহিলা কোন মহিলার (অভিভাবক থাকা সত্ত্বেও) বিবাহ দেবে না এবং কোন মহিলা নিজেও বিয়ে করবে না। কেননা ব্যভিচারিণী মহিলা নিজেই নিজের বিয়ে সম্পন্ন করে থাকে।' (ইবনু মাজাহ- ১৫২৭, বায়হাকী-৭/১১০, দারকুতনী- ৩/২২৭)[৩৯]

কাজেই বিবাহের পূর্ণতার জন্য অভিভাবক এবং দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজন। (তিরমিযী-৪/২৫৩) সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণ এই আবশ্যকতার বাস্তবায়ন করে গেছেন।

বিবাহ হবে প্রকাশ্যে

বিবাহ গোপনে নয় বরং তা হবে প্রকাশ্যে। বিবাহের স্থান নির্ধারণ হবে প্রকাশ্য জায়গায়- মসজিদে কিংবা প্রাঙ্গণে। বিবাহের কারণে পাত্র প্রকাশ্যভাবে ওলীমা ভোজের ব্যবস্থা করবে।

বিবাহ একটি সামাজিক কাজ। আত্মীয়স্বজন এবং সমাজের সংশ্লিষ্ট মানুষজনকে শামিল করে বিবাহ কাজ সম্পন্ন করা উচিত। নবী (সা.) কিংবা সাহাবা কেরামের সময়ে মসজিদে বিবাহ হত কিংবা হত প্রকাশ্য জায়গায়।

দৃষ্টান্তমূলক বিবাহ

সমাজে ইসলামী বিবাহকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করা মানুষ নিজেদের এবং নিজেদের পুত্র-কন্যাদের দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করতে পারেন। বিয়ের জন্য ইসলাম যে সকল বিষয় অনুমোদন করে, কেবল তার ওপর জমে থেকে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করার ঈমানী মনোবল পেশ করতে পারলে অনৈসলামী রসম-রেওয়ায, সংস্কার, অনুষ্ঠান, অশ্লীলতা, বাড়াবাড়ি নিজ থেকেই দূর হয়ে যাবে। 'জায়াল হক্ক অ যাহাকাল বাতিল'— মুমিনের জীবন যাপনে ঈমানী চেতনা, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালের জবাবদিহির চেতনা থাকলে তা বাস্তব রূপ লাভ করবে। ইসলামী মনোভাবের যুবক-যুবতীদের আনুষ্ঠানিক গণবিবাহ, প্রভাবশালী পুত্র-কন্যাদের সহজ-সরল বিবাহ, ওলীমায় ও দ্বীনী নেতৃবৃন্দের পুত্র-কন্যাদের বিবাহ এ রকম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বিবাহ, সাহাবায়ে কেরামগণের অসংখ্য জনের বিবাহ এজন্য আজকের সমাজের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা যেতে পারে। বর্তমান সমাজে বিনা পণে এবং অনাড়ম্বরভাবে বিবাহ করার মত মানসিকতা যাদের আছে, বলা যেতে পারে বাতিলের সয়লাবে নিজেদের অপবিত্র না করে দ্বীনের এক একটি সুন্নাত বাস্তবায়ন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। এই ঈমানী চেতনা যত বেশি বিস্তার করবে ইসলামী সমাজ ততই অন্যের কাছে আদর্শ হবে।

সহজ বিবাহ

বরাবরই সমাজ জীবনের কত রসম-রেওয়াজ যা তথাকথিত সামাজিকতা বলে চিহ্নিত, বিবাহকে কঠিন করে দেয়। ইসলামী আদর্শের সাথে যারা একাত্মতা পোষণ করেন তাদের সামাজিকতা হলো—যা রাসূল (সা.) বলেছেন, করেছেনও এবং খোলাফা-এ রাশেদীনের সময়কালে অজস্র সাহাবায়ে কেরামগণ বিয়ের জন্য যা, যেমনভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন সেই আদর্শ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করার নাম-ই সামাজিকতা। দেশকাল নির্বিশেষে তার মৌলিক দৃষ্টিকোণ প্রতিপালিত হলে মুসলিম উম্মাহ বিশ্বজনীন আদর্শিক জাতি হিসেবে আদর্শ সমাজ গঠনের প্রতীক হতে পারত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামগণের দৃষ্টান্তের চেয়েও দেশীয় রসম-রেওয়ায, বংশীয় মর্যাদার তথাকথিত পরিচয় এবং পারিপার্শ্বিক সমাজ ভাবনার প্রভাব মুসলিম সমাজ জীবনে শিকড়সহ ডালপালা বেশী বিস্তার করেছে, বিবাহের মত আবশ্যিক সুন্নাত পালনে ভেজাল ঢুকেছে। বিবাহ কঠিন হয়েছে। ইসলাম ও কুরআন-সুন্নাহ খোদ মুসলমান সমাজের কাছে উপেক্ষিত হয়েছে ও হচ্ছে। যে আদর্শভিত্তিক সামাজিকতা মুসলমানদের কাছে আবশ্যিক হওয়ার কথা ছিল, তা আজ হচ্ছে অনাবশ্যক—এতে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী হলেও। কুরআন সুন্নাহর আদর্শ ঈমানদারের হাতে নিষ্পেষিত হলেও তার চেতনাবোধ কম লোকের আছে।

সুতরাং বিবাহকে সহজ করার জন্য প্রয়োজন পাত্র পাত্রী নির্বাচনে সমতার ইসলামী দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে জাঁক জমকহীন বা অনাড়ম্বরভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা।

বিবাহের প্রীতি উপহার-মোহর আবশ্যক

বিবাহ- নারী ও পুরুষের মধ্যেকার শরীয়াতী বন্ধন- মীছাকান গালীযা। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো মোহর বা মোহরানা। এটা কণ্যের মূল্য নয় কিংবা নয় বিক্রয় চুক্তি। বরং বিবাহের বিনিময় স্বরূপ স্ত্রীর জন্য প্রীতি

উপহার। এটা নারী সমাজের জন্য শ্রেষ্ঠ অবদান যে, স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে স্বামী তার আর্থিক যোগ্যতা মান হিসেবে দেয় কিছু অর্থ বা তার সাথে কিছু আসবাব সামগ্রী। একে যৌতুক বা অন্য নামে চিহ্নিত করা যায় না। মোহর (মাহর) বা যৌতুক এক কথা নয়। পিতার যোগ্যতা অনুসারে কন্যার নতুন সংসার গড়ার লক্ষ্যে কিছু সামগ্রী দেওয়া হয়। তাকে যৌতুকও বলা যায়। আর্থিক অসচ্ছলতা থাকায় উভয়পক্ষের সদ্‌ভাবের বিনিময়ে এটার বাধ্যবাধকতা থাকেনা। কিন্তু মোহর যতই কম হোক তা দেওয়া বাধ্যতামূলক। বাংলার মুসলিম সমাজে মোহর আদায় নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। অনেক সময় এর গুরুত্ব ও দায়বদ্ধতা না বোঝার কারণে মোহর আদৌ দেওয়া হয় না। কিংবা জানাযায় দাঁড়িয়ে আত্মীয়গণের মাধ্যমে এমন সময় স্ত্রীর কাছ থেকে মোহর মাফ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

'এটা অবশ্যই যুলুম, নীতিহীন বা স্ত্রীর প্রতি অসম্মানের নিদর্শন। কুরআন মোহর দানকে করেছে ফরয বা অবশ্য পালনীয়।' (সূরা নিসা, আয়াত:২৪)[৪০] কুরআন ওকে বলেছে আজর (পুরস্কার) এবং সাদুকা (সাদকা নয়), যার অর্থ সত্য। অর্থাৎ এই প্রীতি ও উপহারের বাস্তবতা মেনে নেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

মোহর হল আর্থিক বিনিময়। যেমন কুরআন বলে, 'নিজেদের সম্পদের বিনিময়ে তাদের বিয়ে করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।' (সূরা নিসা, আয়াত:২৪)[৪১] রাসুল সা বলেছেন, 'মোহর হচ্ছে সেই জিনিস যার বিনিময়ে তোমরা তোমাদের স্ত্রীর গুপ্তাংশ হালাল করে নাও।' (বুখারী)[৪২] আরো সতর্ক করে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি কোন নারীকে মোহর দানের শর্তে বিয়ে করল, অথচ সে নিয়ত করেছে মোহর পরিশোধ না করার, তবে সে যেনাকারী বা ব্যভিচারী।'[৪৩] কুরআন বলে দিয়েছে, 'মনের সন্তোষ সহকারে (ফরয মনে করে) স্ত্রীদের মোহর পরিশোধ করে দাও।' (সূরা নিসা, আয়াত: ৪)[৪৪]

ইসলামী দৃষ্টিতে মোহর অগ্রিম দিতে হবে কিংবা তার কিছু অংশ স্ত্রীর হাতে না দিয়ে তার সঙ্গে সহবাস করা অবাঞ্চনীয়। এজন্য (১) মোহর দিতে হবে ফরয মনে করে, (২) সন্তুষ্ট চিত্তে মোহর পরিশোধ করতে হবে,

(৩) বাসর রাতে মোহর পরিশোধ করা উচিত, (৪) স্ত্রী ইচ্ছা করলে মোহরের কিছু অংশ মাফও করে দিতে পারে বা সম্পূর্ণ দাবি করতে পারে— যা তার পূর্ণ অধিকার। আবার ইচ্ছা করলে এই কারণে স্বামীকে অবকাশ দিতে পারে। মোহরের অর্থ নগদ কিংবা দ্রব্য সামগ্রীও হতে পারে।

মোহরের শুদ্ধ কথা হলো 'মাহর', কিন্তু সমাজে চালু আছে মোহরানা বা দেনমোহর। আরবী 'দায়ন' থেকে দেন যার অর্থ দেনা কিংবা বিলম্ব করা। বাস্তবে এক সময় তা দেনাই থেকে যায়, পরিশোধ করা হয় না। এও এক রকম সামাজিক অপরাধ।

মোহরের পরিমাণ কি হবে, কতটা হবে?

ফিকাহ শাস্ত্রের একাংশের মতে তা দশ দিরহামের কম হবে না। কিন্তু কুরআন হাদীস থেকে জানা যায় পাত্রীর আর্থিক যোগ্যতা অনুসারে অধিক পরিমাণে হতে পারে। যেমন কুরআন বলছে, 'তোমরা যদি এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করো, তবে তা রাশি রাশি (ক্বেনতার) সম্পদ দিয়ে থাকলেও তার থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিতে পারবে না। (সূরা নিসা, আয়াত: ২০)[৪৫] তাই মোহরের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। বেশী হতে পারে, কমও হতে পারে। এক হাদীস থেকে জানা যায় যে, 'সর্বোত্তম পরিমাণের মোহর হচ্ছে তাই যা পরিশোধ করা সহজ হয়।' (আবু দাউদ, হাকেম)[৪৬]

মোহর যাতে সহজ হয় তার জন্য নিম্ন হাদীসটাও এক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি পেশ করে। হযরত সাহল বিন সাদ বর্ণনা করেন, একবার রাসূল (সা.)-এর নিকট একজন স্ত্রীলোক এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.), আমি নিজেকে আপনার জন্য দান করলাম। (অতঃপর) অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন ওকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিন, যদি তাকে দিয়ে আপনার প্রয়োজন না থাকে। তিনি (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে তাকে মোহর দেওয়ার মতো? তিনি (ব্যক্তিটি) বললেন, এই লুঙ্গি ছাড়া আমার কিছুই নেই। তিনি (সা.) বললেন, তবে খুঁজে নিয়ে আসো, কিছু— যদিও তা হয় একটি

লোহার আংটি। ব্যক্তিটি খুঁজলেন, কিছু পেলেন না। তখন রাসূল (সা.) বললেন, তোমার সঙ্গে কি কুরআনের কিছু অংশ আছে? ব্যক্তিটি বললেন, হ্যাঁ ! অমুক অমুক সূরা। তারপর তিনি (সা.) বললেন, তবে আমি তাকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম ঐ কুরআন শিক্ষার বদলে। অপর বর্ণনায় আছে - 'যাও আমি তাকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম, তুমি তাকে কুরআন শেখাবে।' (বুখারী - ৫/৫১২১, মুসলিম- ৫/৪৭৪৪)[৪৭]

আজকের সমাজ মোহরকে একটা প্রদর্শনীমূলক রসম-রেওয়ায মনে করে নিয়েছে। বিয়ের সময় সামঞ্জস্য করে একটা অংক ঘোষণা করা হয় কিন্তু বিয়ের পর তা বেমালুম ভুলে যায়। অথচ নারীকে হালাল করার জন্য এই বিনিময় তার জন্য ছিল ফরয, সারা জীবনে তা পরিশোধ করলো না। আল্লাহর বিচারে এমন লোক পাপী ও ব্যভিচারী গণ্য হবে।

বিয়ের জন্য কনের অভিভাবকের নিকট থেকে দাবি করে কিছু আদায় করা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ। অধিকাংশ মুসলমান তা বোঝেও না। আজকাল পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে দাবি করে কিছু অর্থ বা যৌতুক আদায় করে, এটা জঘণ্য রীতি, ইসলাম একে সমর্থন করে না। ইসলামের বিধান মতে 'পাত্রই পাত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে। পাত্রীর যা কিছু প্রয়োজন তার সবই সামঞ্জস্য ভাবে পাত্রকে বহণ করার দায়িত্ব নিতে হবে। এই কারণেই সংসার জীবনে পুরুষকে নারীর ওপর কর্তৃত্ব দান করা হয়েছে।'(সূরা নিসা, আয়াত : ৩৪)[৪৮] মানুষের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সুখ-শান্তি নির্ভর করে দাম্পত্য সুখ শান্তির উপর। কিন্তু ইসলামের সরল নীতিমালা ত্যাগ করে— মুসলমান সমাজের দুর্দশা, দাম্পত্য কলহ, আত্মহত্যা ও খুন হতে হচ্ছে বাঁকা পথে চলার জন্য। উভয়ে উভয়ের প্রতি আন্তরিক ও প্রীতিপূর্ণ ভালোবাসায় একাত্ম হবার চেষ্টা করলে সংসার সুখের হবে, দাম্পত্যজীবনও হবে মধুর।

1 و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا. اليها وجعل بينكم مودة و رحمة

2 = ألرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم. على بعض. و بما انفقوا من. اموالهم

6 ولقد ارسلنا رسلا من قبلك و جعلنا لهم ازواجا و ذرية

7 و هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا

8 و انكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم

11 و ابتلوا. اليتامى حتى. اذا بلغوا. النكاح

12 و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم

13 فعدتهن ثلاثة اشهر و الاءي لم يحضن-

14 قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم -ذالك ازكى لهم - ان الله خبير بما يصنعون
* و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها
-النور31-30-

15 -حتى اذا جاءو ها شهد عليهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما كانوا يعملون-

16 ان. السمع و البصر و الفواد- كل اولءك كان عنه مس ءولا-- اسراء 17/36
17 و لا تقربوا الزنى انه كان فاحشة و ساء سبيلا -اسراء 17/32

18 و لا متخذي اخدان - الماءدة- 5/5
ولا متخذات اخدان -النساء 4/25-

19 و لا تقربوا الفواحش - الانعام6/151-

20 انما حرم ربي الفواحش-. الاعراف7/33-

21 و ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله - النور 24/33

22 ان يكونوا فقراء يغنيهم. الله من فضله
.النور. 24/32

28 يا ايها الذين امنوا -ان من ازواجكم و اولادكم عدوا لكم فاحذرو هم - التغابن 64/14

29 و الذين يقولون - ربنا هب لنا من ازواجنا و ذريتنا قرة اعين و اجعلنا للمتقين اماما
- الفرقان- 25/74

30 فانكحوا ما طاب لكم من النساء
النساء-4/3-

32 -و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن- ولامة مؤمنة خير من مشركة. ولو اعجبتكم
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا - و لعبد مؤمن خير من مشرك - و لو اعجبكم - اولءك
يدعون الى النار - والله يدعوا الى الجنة و المغفرة باذنه - البقرة- 2/221

34 حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و عمتكم و خالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت و .
امهاتكم التي ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعة و امهات نساءكم و ربائبكم التي في حجوركم من
النساءكم التي دخلتم بهن -فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم - و حلاءل ابناءكم الذين
من اصلابكم- -و ان تجمعوا بين الاختين -الا ما قد سلف -ان الله كان غفورا رحيما + و
المحصنات من النساء

35 و لا تنكوا ما نكح اباء كم من النساء
النساء - 4/22

37 فانكحو هن باذن اهلهن. نساء25- ---40 فاتو هن اجور هن فريضة - نساء24- .
---44 و اتوا النساء صدقاتهن نحلة - نساء4-

45 و اتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيءا- نساء- 20

আদর্শ বিবাহ পদ্ধতি

(কুরআন-সুন্নার আলোকে)

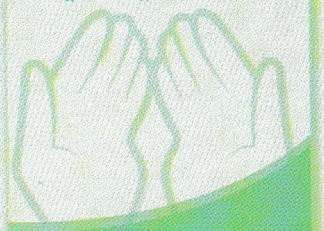

মোঃ তাহেরুল হক

বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট

কলকাতা-১৩